

আব্বাহ তায়ালার রহমতের দৃশ্যমান প্রভাব

বারাকাহ ইফেঙ্কস

গ্রন্থনায় : ফরহাদ খান নাজিম



সূচিপত্র

বারাকাহ কী	০৯
বারাকাহ লাগবে কেন	১৩
দৃশ্যমান বারাকাহ	১৮
গায়েবি বারাকাহ	২৫
শুকরিয়া : বারাকাহর সদর ফটক	৪০
যেভাবে আমরা বারাকাহ হারিয়ে ফেললাম	৫৯
আধুনিক জীবনেও কি বারাকাহ লাভ করা সম্ভব	৬৬
তাড়াহুড়ার সংস্কৃতি : কর্ম যখন ধর্ম হয়	৭৪
তাড়াহুড়ার সংস্কৃতির পাঁচটি স্তম্ভ	৭৮
ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ তাড়াহুড়ার প্রতিষেধক	৯৫
বারাকাহর সংস্কৃতি : তাড়াহুড়ার সংস্কৃতির বিকল্প	১০০
কর্পোরেট বিশ্বে বারাকাহর সংস্কৃতি ধারণ	১৪২
বারাকাহ : কেবলই একটি দুআ নয়	১৪৫
ফজরের বারাকাহ	১৫০
রিজিকে বারাকাহ	১৫৫
জ্ঞানে বারাকাহ	১৫৯
সম্পর্কে বারাকাহ	১৬৩
পার্থিব উপাদানে বারাকাহ	১৬৮
বারাকাহ লাভের অ্যাটমিক হ্যাবিটস	১৭৬
বারাকাহ সম্পর্কিত বিশটি জিস্ট	২০৪

বারাকাহ কী

‘বারাকাহ’ একটি আরবি পরিভাষা। শব্দটি মুসলমানদের কাছে অতি পরিচিত ও হৃদয়ের গভীরে গেঁথে থাকা এক আবেগময় শব্দ। মত, বর্ণ কিংবা ভাষার পার্থক্য থাকলেও মুসলিমমাত্রই বারাকাহকে জানে, অনুভব করে। মুসলিম জীবনের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত বারাকাহ ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। প্রতিদিন কোনো না কোনোভাবে আমরা বারাকাহর ছোঁয়া পাই, এর সৌন্দর্যে নতুনভাবে অভিভূত হই।

মুসলমানরা প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছে বারাকাহর দুআ করে, একে অপরের জন্য কল্যাণ কামনা করে। কারও সঙ্গে দেখা হলে প্রথমেই সালাম বিনিময় করি—‘আসসালামু আলাইকুম’। এই সালামের মধ্যেই রয়েছে রহমত ও বারাকাহর দুআ। আমরা নবিজির ওপর দরুদ পাঠ করি; এর মাধ্যমেও আল্লাহ আমাদের জীবনে বারাকাহ নাজিল করেন। সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, প্রার্থনার প্রতিটি মোড়ে আমরা আল্লাহর কাছে বারাকাহ চাই। তাই মুসলমানদের জন্য বারাকা কোনো অজানা শব্দ নয়; বরং এটি তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কুরআনে ‘বারাকাহ’ ও এর ধাতু থেকে গঠিত শব্দসমূহ বত্রিশবার উল্লেখ হয়েছে। সাধারণভাবে আমরা বারাকাহ বলতে আসমানি কল্যাণকেই বুঝি। তবে আমাদের উল্লেখ্যে কেবলমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এর গভীর ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাদের সংজ্ঞার ভেতর দিয়ে বারাকাহর প্রকৃত রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পারিভাষিকভাবে বারাকাহ মানে হলো কল্যাণের প্রাচুর্য ও প্রবৃদ্ধি। এটি এমন এক উপহার, যা শুধু তাত্ক্ষণিক প্রাপ্তিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণের ধারাবাহিকতায় প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি কোনো কাজে সফল হলেন এবং সেই সফলতা ধারাবাহিকভাবে বজায় থাকল—এটাই বারাকাহ। হঠাৎ পাওয়া কোনো কল্যাণ যদি স্থায়ী না হয়, তবে তা বারাকাহ নয়। যেমন : একটি চারা জন্মাল এবং ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে শক্ত বৃক্ষে পরিণত হলো—এটাই বারাকাহ। কিন্তু যদি অঙ্কুরেই শুকিয়ে যায়, তাহলে তা বারাকাহর অন্তর্ভুক্ত নয়।

কাজেই আমরা তখনই কোনো কিছুকে ‘বারাকাহময়’ বলতে পারি, যখন দেখি—আল্লাহ তাতে কল্যাণ দান করেছেন এবং সেই কল্যাণের ধারা দীর্ঘকাল অব্যাহত রেখেছেন। বারাকাহ হলো এক বীজ, যা কেবল চারাগাছে থেমে থাকে না; বরং সময়ের সাথে সাথে তা এক মহিরুহে রূপ নেয়, আশ্রয় ও ছায়া দেয় অসংখ্য মানুষকে।

বারাকাহর বাস্তব কিছু উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। ধরুন, কোনো বাবা তার একার ইনকাম দিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ নির্বিঘ্নে চালাচ্ছেন। সন্তানদের পড়াশোনা, চিকিৎসা,

জীবনের যাবতীয় খরচ সামলে তিনি পরিবারকে সুখে-শান্তিতে রাখছেন। এটি হওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ তায়ালা তার ইনকামে বারাকাহ দিয়েছেন।

আবার ধরুন, কোনো ফলার বহু বছর আগে কোনো কথা বলে গেছেন কিংবা বহু যুগ আগে একটি কিতাব লিখে গেছেন। আজও সেই কথা বা গ্রন্থ থেকে মানুষ উপকৃত হচ্ছে, নতুন প্রজন্ম ফায়দা পাচ্ছে। বুঝতে হবে, আল্লাহ তায়ালা সেই ফলারের জ্ঞান, জবান ও কলমে বারাকাহ রেখেছেন। তাই তিনি দুনিয়ায় না থাকলেও তার অবদান অটুট থেকে যাচ্ছে।

এমনকি কখনো দেখবেন, আপনি বিশ বছর আগে একটি গাড়ি কিনেছেন। বন্ধুরা এর মধ্যে অনেকবার গাড়ি বদল করেছে, কিন্তু আপনার গাড়ি এখনও দিব্যি চলেছে কোনো বড়ো সমস্যা ছাড়াই। এটিও বারাকাহ।

অন্যদিকে অল্প সময়ে বড়ো কোনো কাজ শেষ করতে পেরেছেন আপনি। অথচ আপনার সহকর্মীরা দিন-রাত একসাথে চেষ্টা করেও সেটি করতে হিমশিম খাচ্ছেন। একে শুধু ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতা বলে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এটি মূলত আল্লাহর तरফ থেকে আপনার কাজে ও সময়ে নাজিল হওয়া বারাকাহ।

এই সত্যকে আমরা প্রায়শই ভুলে যাই। কিন্তু ইতিহাসে এর অসংখ্য প্রমাণ আছে। খাইবারের যুদ্ধে আলি রা. ইহুদিদের দুর্গের বিশাল দরজার একটি কপাট এক ধাক্কায় উপড়ে ফেলেছিলেন। শুধু উপড়েই থামেননি; সেটিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন অক্লান্তভাবে। যুদ্ধ শেষে প্রায় চল্লিশজন পুরুষ মিলে সেটিকে তুলতে পারেনি। তাহলে কি একে কেবল আলি রা.-এর শক্তি ও বীরত্বের সীমায় বেঁধে দেওয়া যায়? না, এটি ছিল আল্লাহ প্রদত্ত বারাকাহ; যার মাধ্যমে তাঁর শক্তি সাধারণের সীমা ছাড়িয়ে অসাধারণ পৌঁছে গিয়েছিল।

স্বয়ং আলি রা. যুদ্ধ শেষে আবার সেই দরজার কপাট তুলতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি। ভাবুন, যুদ্ধের উত্তেজনা থেমে গেছে, শরীরে আগের মতো উদ্দীপনা নেই। তখন তাঁর নিজের শক্তি দিয়েই চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সেই ভারী কপাট এক ইঞ্চিও নড়াতে পারেননি। এখানেই বোঝা যায়, সেটি ছিল আল্লাহর तरফ থেকে দেওয়া এক অনন্য বারাকাহ। সংকটময় মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা আলি রা.-এর বাহুতে এমন শক্তি দান করেছিলেন, যা সাধারণ শক্তির সীমাকে অতিক্রম করে যায়। ফলে তিনি এক ধাক্কায় কপাট ভেঙে ঢাল বানিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। বারাকাহ ঠিক এমনই—মানুষকে নিয়ে যায় তার স্বাভাবিক পরিমাপের উর্ধ্বে।

নবিজির জীবনে বারাকাহর অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। একবার এক সাহাবি নবিজির জন্য সামান্য খাবার রান্না করেছিলেন। হয়তো চার-পাঁচজন মানুষ পেট ভরে খেতে পারবে—এই ছিল তাঁর হিসাব। নবিজিকে দাওয়াত দিলে তিনি একা যাননি; সঙ্গে নিয়ে গেলেন অনেক সাহাবিকে। স্বাভাবিকভাবেই মেজবানের বুক কেঁপে উঠল, এত অল্প খাবারে এতজনের উদরপূর্তি কীভাবে সম্ভব! কিন্তু আল্লাহর রাসূল যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে বারাকাহ প্রদানও আল্লাহরই দায়িত্ব।

নবিজি তাঁকে বলে দিয়েছিলেন—‘আমি না আসা পর্যন্ত খাবারের পাত্র খোলা যাবে না।’ নবিজি এসে নিজের হাতে প্রথম ঢাকনা তুললেন। তারপর সবার মাঝে খাবার পরিবেশন করতে শুরু করলেন। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো—যে খাবার সর্বোচ্চ চার-পাঁচজনের জন্য যথেষ্ট ছিল, সেটিই

পুরো জামাতকে তৃপ্ত করেছে। তা-ই নয়, শেষে মেজবানের পরিবারের জন্যও যথেষ্ট খাবার অবশিষ্ট ছিল। সুবহানআল্লাহ, এটাই বারাকাহ!

বারাকাহ মানেই হলো, অল্পতে অধিক প্রাপ্তি। ‘More with Less’—এই কথাটিই বারাকাহর সহজ ব্যাখ্যা। কেউ বারাকাহর কারণে একাই দিনের সব কাজ শেষ করে ফেলে, অথচ ক্লান্ত হয় না। আবার অন্য কারও ক্ষেত্রে দেখা যায়, একই কাজ তিনজন মিলে করেও হাঁপিয়ে যাচ্ছে, কাজ শেষ হচ্ছে না।

বারাকাহ চোখ দিয়ে দেখা যায় না, কিন্তু হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। সামান্য মনোযোগ দিলেই প্রতিটি কাজে এর ছাপ স্পষ্ট বোঝা যায়। কারও মাসিক আয় মাত্র বিশ হাজার টাকা, তবুও তিনি সুন্দরভাবে পুরো মাস কাটিয়ে দেন। আবার কারও আয় দুই লক্ষ টাকা হলেও দিনের খরচ সামলাতে হিমশিম খেতে হয়। পার্থক্য একটাই—প্রথমজন আল্লাহর পক্ষ থেকে বারাকাহ লাভ করেছেন, দ্বিতীয়জন তা পাননি।

বারাকাহ মানুষের জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। তাই আমাদের বারবার বারাকাহর জন্য দুআ করতে বলা হয়েছে। শুধু নিজেদের জন্য নয়, অপরের জন্যও আমরা বরকতের দুআ করব। রাসূলুল্লাহ সা. নির্দেশ দিয়েছেন—যখন আমরা কারও ভালো কিছু দেখব, তখন যেন তার জন্য বারাকাহ কামনা করি। হাদিসে স্পষ্টভাবে বারণ করা হয়েছে, কারও প্রাচুর্য বা অধিক্য দেখে শুধু বিস্মিত হওয়া যাবে না; বরং তার জন্য দুআ করতে হবে। এজন্যই আমরা কারও ভালো কিছু দেখলে বলি—‘মাশাআল্লাহ, আল্লাহুম্মা বারিক লাহু/লাহা।’

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের বারাকাহ অনুসন্ধান করতে হবে। যে কাজে বারাকাহ পাওয়া যাবে, সেই কাজেই এগোতে হবে। আর যে কাজে বারাকাহর আভাস নেই, সেটি ছেড়ে দিতে হবে। কারণ, বরকতমুক্ত কাজে শক্তি ক্ষয় হয়, কিন্তু ফল আসে না। এমন কাজ কেবল ক্লান্তি বাড়ায়, কল্যাণ আনে না। তাই যেকোনো কাজ শুরু করার আগে আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে—তিনি যেন সেই কাজে বারাকাহ দান করেন। সব মিলিয়ে আমাদের হৃদয়ে গড়ে তুলতে হবে এক গভীর বারাকাহ মনোভাব।

আল্লাহর রাসূল সা. তাঁর জীবনের প্রতিটি কাজেই বারাকাহর দুআ করেছেন। যদি তাঁর বারাকাহ সম্পর্কিত সব দুআ একত্র করা যায়, তবে একটি বৃহৎ দুআ সংকলন রচিত হয়ে যাবে। শুধু তিনি নন; তাঁর সাহাবিরাও ছিলেন এ মনোভাবের ধারক। তাঁরা ছিলেন মুত্তাকি, পরহেজগার, তবুও নিজেদের জীবনে বারাকাহকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। প্রতিনিয়ত এর জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন। কখনোই বারাকাহর প্রয়োজনকে উপেক্ষা করেননি।

বারাকাহ লাগবে কেন

আগেই বলা হয়েছে—‘বারাকাহ’ শব্দটি বিভিন্নরূপে কুরআনে ৩২ জায়গায় এসেছে এবং তা ২৪টি সূরায় উল্লিখিত হয়েছে। বিষয়টি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং পুরো কুরআনকে ‘বরকতময়’ আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন—

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكٌ

‘আর এটি একটি কিতাব, আমি তা নাজিল করেছি বরকতময় করে।’^১

অর্থাৎ কুরআন শুধু দিশারির কিতাব নয়; এটি বরকতের অফুরন্ত ভান্ডার। এর প্রতিটি আয়াত, প্রতিটি অক্ষর মানুষের জীবনে অগণিত কল্যাণের দ্বার খুলে দেয়।

ওপরের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে ‘বরকতময়’ আখ্যা দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন আসে—সাধারণত আমরা বারাকাহ বলতে বুঝি বৃদ্ধি বা প্রবৃদ্ধি। কিন্তু কুরআন তো আর বৃদ্ধি পাচ্ছে না। যেভাবে নাজিল হয়েছে, সেভাবেই রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই থাকবে। তাহলে কুরআন বরকতময় হলো কীভাবে?

এর ব্যাখ্যা আমরা পাই হাদিসে নববিতে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন—

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. لَا أَقُولُ: الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ
أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি বর্ণ পাঠ করবে, তার একটি নেকি হবে। আর একটি নেকি দশ গুণ সমান হয়। আমি বলছি না যে আলিফ-লাম-মিম একটি বর্ণ; বরং আলিফ একটি বর্ণ, লাম একটি বর্ণ এবং মিম একটি বর্ণ।’^২

এই হাদিস আমাদের সামনে বারাকাহর ধারণাটিকে স্পষ্ট করে দেয়। রাসূলুল্লাহ সা. জানাচ্ছেন—একটি হরফ পড়লে আল্লাহ তায়ালা দশটি নেকি দান করবেন। তাহলে ‘আলিফ-লাম-মিম’ পাঠ করলে একসাথে পাওয়া যাচ্ছে ত্রিশটি নেকি। এখানেই বারাকাহর বাস্তব রূপ ধরা দেয়।

^১ সূরা আনআম : ১৫৫

^২ সুনানে তিরমিজি : ২৯১০

প্রথমত, আল্লাহ চাইলে একটি শব্দের বিনিময়ে একটি নেকি দান করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি; বরং তিনটি হরফকে আলাদা গণনা করে প্রতিটির বিনিময়ে নেকি লিখে দিয়েছেন। এর মানে হলো, অল্প তিলাওয়াত করেও বহু গুণ সওয়াব লাভ করা যায়।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ চাইলে একটি হরফের বিনিময়ে একটি নেকিই ঘোষণা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এর চেয়ে অনেক বেশি দিয়েছেন—একেকটি হরফে দশ নেকি। এখানে ‘More with Less’ বা ‘অল্পে অধিক প্রাপ্তি’র বাস্তব উদাহরণ দেখা যায়।

এই শিক্ষা শুধু কুরআনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বারাকাহর এই ফরমুলা কার্যকর হয়। আল্লাহ যখন কোনো কাজে বারাকাহ দান করেন, তখন ফলাফল চেষ্টার তুলনায় বহু গুণ বেড়ে যায়। ঠিক কত গুণ বাড়বে, তা শুধু আল্লাহই জানেন। হাদিসে কোথাও সত্তর গুণ, কোথাও সাতশ গুণ পর্যন্ত উল্লেখ আছে। তবে এটিই সীমা নয়। আল্লাহ তাঁর বান্দাকে দান করেন বেহিসাব।

এখানেই রয়েছে এক অপূর্ব বৈপরীত্য—আমরা আল্লাহর রাস্তায় দান করার সময় হিসাব কষি, মাপজোক করি; অথচ তিনি যখন আমাদের দেন, তখন অগণিত ও অসীমভাবে দেন।

দেখবেন, কখনো কেউ একটি বিশাল বাগান পরিচর্যা করেও সামান্য ফলন পায়; অথচ অন্য কেউ মাত্র দুই-তিনটি গাছ থেকে এমন ফলন সংগ্রহ করে যে, পুরো বাগানের ফলনের সমান হয়ে যায়। এটিই বারাকাহর ফসল। আমরা অনেক সময় ভুল করে মনে করি—এগুলো আমাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল। কিন্তু আসল সত্য হলো, আল্লাহ যদি কোনো কাজে বারাকাহ না দান করেন, তবে মানুষ শত চেষ্টা করেও সেখান থেকে প্রকৃত সুফল পাবে না। কেবল গায়ের জোরে যদি কল্যাণ আসত, তবে দেশের কুলি-মজুররাই হতো সবচেয়ে বিত্তবান। কারণ তারা যে পরিমাণ শারীরিক শ্রম করে, আর কেউ তা করে না।

আল্লাহ তায়ালা কাউকে কতটা ভালোবাসেন, এটা বোঝার একটি উপায় হলো তাঁর জীবনে বারাকাহ খুঁজে দেখা। কারও জীবন যদি বারাকাহতে পরিপূর্ণ হয়—বুঝতে হবে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। তাঁর প্রতিটি কাজ আল্লাহ বরকতময় করে দেন; এমনকি তাঁর কথাও হয়ে ওঠে কল্যাণকর। এর সর্বোত্তম উদাহরণ ছিলেন আমাদের নবিজি। আল্লাহ তাঁকে এত ভালোবাসতেন যে, তাঁর চাহনি, হাসি, উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ; সবকিছুই হয়ে উঠেছিল বরকতময়।

সাহাবায়ে কেরাম এ বারাকাহকে পুরোপুরি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই আমরা দেখি—কেউ তাঁর কথার মাধুর্যে বিমোহিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন; কেউ কেবল তাঁর হাসি দেখেই মুগ্ধ হয়েছেন; কেউ আবার তাঁর তিলাওয়াত শুনে আজন্ম শত্রু থেকে বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়েছেন। সাহাবিরা তাঁর শরীর থেকে নির্গত ঘাম সংগ্রহ করে সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করতেন। তাঁর খুতু ফেললে সেটি সংগ্রহ করতে তাঁরা প্রতিযোগিতা করতেন। তাঁর অঙ্গুর পানি মাটিতে পড়তে দিতেন না; আগেই তা সংগ্রহ করে পান করে নিতেন। এককথায়, আল্লাহর অফুরন্ত ভালোবাসার কারণে নবিজির জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপই পরিণত হয়েছিল অবিরাম বারাকাহতে।

তাদের বিশ্বাস ছিল, বারাকা ছাড়া কোনো কাজের সঠিক ফল আসবে না। তাই সাহাবায়ে কেরাম খেতের প্রথম ফলনটি নিয়ে আসতেন রাসূল সা.-এর দরবারে। তিনি সেটি হাতে নিয়ে দুআ করতেন। তাঁর দুআর পরেই তারা ফসল কাটিতে শুরু করতেন। তাঁরা জানতেন, বারাকাহ ছাড়া

কাজ করা মানে ভস্মে ঘি ঢালা; দেখতে ঝলমল করলেও ফলাফলে শূন্য। কারণ তখন সময়, শ্রম আর উপকরণ কেবল অপচয় হয়; কিন্তু প্রকৃত কল্যাণ মেলে না।

আমরা মুসলমানরা নিজের অজান্তেই বারাকাহর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। প্রতিদিনই আমরা আল্লাহ তায়ালার বরকত কামনা করি, কখনো বুঝে, কখনো না বুঝেই। কারও সঙ্গে দেখা হলে বলি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। এটি আসলে বারাকাহর দুআ। ঈদের দিনে বলি, ঈদ মুবারক অর্থাৎ আপনার ঈদ বরকতময় হোক। এটাও বারাকাহর দুআ। আবার কারও বিয়ে হলে আমরা বলি—বারাকাতুল্লাহ্ লাকা, ওয়া বারাকা আলাইকা...এভাবেও নবদম্পতির জন্য বরকতের দুআ করি।

খাবার গুরুর আগেই আমরা বলি, বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহর নামে এবং তাঁর বরকতের ওপর নির্ভর করে। এ ছাড়া আরও অনেক দুআ রয়েছে, যা আমরা প্রতিদিনই পড়ি, হয়তো সব সময় অর্থ বুঝি না, তবুও পড়ি। এগুলোই আমাদের ইসলামি সংস্কৃতির অংশ। আমাদের পূর্বসূরির বিষয়টি গভীরভাবে বুঝেছিলেন বলেই প্রতিটি কাজ বরকতময় করার জন্য আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন এসব দুআর কালচার। আমাদের শিখিয়েছেন এবং তা পড়ার তাগিদও দিয়েছেন।

বারাকাহ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ—এর আরেকটি দিক হলো, এটি মানুষকে মুত্তাকি করে তোলে। যখন বান্দা মুত্তাকি হয়, আল্লাহ তাকে বেহিসাব দান করেন। তাকে প্রতিটি কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি দেন। তার জীবনকে করে দেন সহজ ও সাবলীল। কখনো আমরা এমন পরিস্থিতিতে পড়ে যাই, যেখানে দৃশ্যত কোনো পথ খোলা থাকে না। তবুও আল্লাহ তায়ালার মুত্তাকি বান্দার জন্য উত্তরণের রাস্তা তৈরি করে দেন। কুরআনে বলা হয়েছে—

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

‘যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ করে দেন।’^৩

এখন প্রশ্ন হলো, বারাকাহ কীভাবে আমাদের মুত্তাকি বানায়? যখন আমরা বারাকাহর প্রকৃত ধারণা বুঝে যাই, তখন পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এর মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। তাঁর হাতেই রয়েছে বারাকাহর চাবিকাঠি। সুতরাং বারাকাহ পেতে হলে আমাদের আল্লাহকে খুশি করতে হবে। আর যখন একজন বান্দা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়তে কাজে নামে, ধীরে ধীরে সে মুত্তাকি হয়ে ওঠে।

অন্যভাবে বললে বারাকাহ হলো এক আলোকিত পথের দিশারি। এর সূত্র ধরেই বান্দা শিখে যায়—শক্তি, সামর্থ্য, প্রাচুর্য কিছুই আসল নয়; আসল হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর এই উপলব্ধি বান্দাকে টেনে আনে তাকওয়ার পথে।

বারাকাহ কেবল একটি রহস্যময় বা অতিপ্রাকৃত বিষয় নয়। এটি আসলে প্রতিটি স্থায়ী কল্যাণের পেছনের নীরব শক্তি। মাঝে মাঝে এ শক্তি এমনভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয় যে, আমরা তা চোখে দেখি, হাতে মাপতে পারি এবং বিস্মিত হই। সামান্য খাবার বহু মানুষকে তৃপ্ত করতে

পারে। অল্প সময়ে কেউ অনেক বড়ো কাজ গুছিয়ে নিতে পারে। অল্প টাকায় কেউ সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাতে পারে। এসবই দৃশ্যমান বারাকাহর চিহ্ন।

আবার অনেক সময় বারাকাহ কাজ করে খুব সূক্ষ্মভাবে। তখন আমরা তার উপস্থিতি শুধু অনুভব করতে পারি। যেমন : হৃদয়ে হঠাৎ প্রশান্তি নেমে আসা, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সহজতা পাওয়া কিংবা যুক্তি যেখানে ব্যর্থতার ভবিষ্যদ্বাণী করে, সেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে সফলতা লাভ করা। এখানেই বোঝা যায়, বারাকাহর দুটি স্তর রয়েছে—একটি দৃশ্যমান, অপরটি অদৃশ্য। দৃশ্যমান বারাকাহকে আমরা চোখে দেখি, পরিমাপ করি। অদৃশ্য বারাকাহকে চোখে ধরা যায় না; কিন্তু অন্তরের দৃষ্টি তা অনায়াসে শনাক্ত করে ফেলে।

বারাকাহর প্রবৃদ্ধি সব সময় সংখ্যার আকারে প্রকাশ পায় না। এটি বরং যেকোনো কিছুইর ভেতর এনে দেয় অগণিত ফায়দা, অনির্ণেয় কল্যাণ এবং এমন সাফল্য, যা কেবল বস্তু বা সময়ের হিসাবে সহজে বোঝা যায় না। কখনো সময় বলে দেয়, এই কাজ এত অল্প সময়ে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কিন্তু দিনশেষে দেখা যায়, কাজটি সফলভাবে শেষ হয়ে গেছে। এটাই বারাকাহ।

একইভাবে আপনার কাছে লক্ষ্য পূরণের জন্য যতটুকু উপকরণ আছে, তা হিসাব করলে কখনোই যথেষ্ট বলে মনে হয় না। কিন্তু সেই যৎসামান্য উপকরণ দিয়েই কাজটি সমাধান হয়ে যায়। এটিও আল্লাহর তরফ থেকে নেমে আসা বারাকাহ।

তবে ভুল হবে যদি আমরা বারাকাহকে কেবল ‘মিরাকল’ বা অলৌকিক বিষয় হিসেবে দেখি। আসলে বারাকাহ হলো, এক ঐশী প্রাচুর্য। এটি নেমে আসে পার্থিব উপকরণের ওপর এবং তাকে দান করে এক অপার্থিব সফলতা। যেমন বাতাসের স্পর্শে স্থির পানিও ঢেউ তুলে দেয়, তেমনি বারাকাহর স্পর্শে সীমিত উপকরণও সীমাহীন ফল নিয়ে আসে।

দৃশ্যমান বারাকাহ

দৃশ্যমান বারাকাহ এমন এক বিশেষ অবয়ব নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়, যা আমরা চোখে দেখি, সময়ের ব্যবধানে মাপতে পারি, অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করতে পারি। এটি সাধারণত এতটাই স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় যে, যারাই এর সম্মুখীন হয়, তারাই সহজেই বুঝে ফেলে—এখানে আল্লাহর বরকত নেমে এসেছে। চলুন এবার দেখে নিই, কুরআনে দৃশ্যমান বারাকাহর কিছু নিদর্শন কীভাবে বর্ণিত হয়েছে।

রিজিকে বারাকাহ

ঈমান ও তাকওয়ার ফলস্বরূপ আসমান-জমিনের অফুরন্ত বারাকাহ মানুষের জন্য উন্মুক্ত হয়। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন—

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

‘আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে অবশ্যই আমি আসমান-জমিনের বরকতসমূহ তাদের জন্য খুলে দিতাম।’^৪

এটি এমন এক প্রতিশ্রুতি, যা সরাসরি মানুষের জীবনে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এটি অনুধাবন করতে গভীর দার্শনিক হওয়া লাগে না। যখন জমিতে বৃষ্টির ফোঁটা নামে, খেত ভরে যায় সোনালি ধানে কিংবা তখন অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি আসে—এসবই দৃশ্যমান বারাকাহর জীবন্ত চিত্র।

দৃশ্যমান বারাকাহর ছোঁয়ায় কৃষকের ফসল আশার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ফলন দেয়। ব্যবসায়ীর বাণিজ্যে আসে অপ্রত্যাশিত লাভ। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির ভয়াবহতা থেকে আল্লাহ রক্ষা দান করেন। এমনকি অনেক সময় দেখা যায়, কয়েক প্রজন্ম ধরে পিছিয়ে থাকা একটি জাতি হঠাৎ করেই এগিয়ে যায় কয়েক ধাপ। এই অগ্রগতি কেবল মানবচেষ্টার ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়; এর পেছনে থাকে আল্লাহর বারাকাহর হাতছানি।

অতএব, রিজিকে বারাকাহ একটি বাস্তব সত্য। তবে এটি কারও জন্য কতটা উন্মোচিত হবে, তা নির্ভর করে তার ঈমান ও তাকওয়ার ওপর। ওপরের আয়াত আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে—আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর ভয়-ভক্তিই হলো সেই চাবিকাঠি, যা আসমান-জমিনের বরকতের দরজা খুলে দেয়।

নবি-রাসূলগণের জীবনে দৃশ্যমান বারাকাহ

^৪ সূরা আরাফ : ৯৬

ফেরাউনের সৈন্যদল দ্বারা ধাওয়া খেয়ে নবি মুসা আ. তাঁর কওমকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালেন সমুদ্রতীরে। সামনে অনন্ত জলরাশি, পেছনে রক্তপিপাসু ফেরাউন বাহিনী। দৃশ্যত কোনো পথ খোলা নেই। তখন আল্লাহ তায়ালা মুসা আ.-কে নির্দেশ দিলেন, হাতের লাঠি দিয়ে সমুদ্রের দিকে আঘাত করতে। তিনি আদেশ পালন করলেন। আর মুহূর্তেই ঘটল অভাবনীয় দৃশ্য। সমুদ্রের পানি দু-ভাগ হয়ে গেল, সৃষ্টি হলো নিরাপদ এক রাস্তা। মুসা আ. তাঁর কওমসহ সেই শুকনো রাস্তা দিয়ে পার হয়ে গেলেন ওপারে।

ফেরাউন ও তার বাহিনীও সেই রাস্তা ধরে এগোতে লাগল। কিন্তু মাঝ সমুদ্রে পৌঁছতেই আল্লাহ তায়ালা সেই বারাকাহময় পথ গায়েব করে দিলেন। বিশাল জলরাশি আবার মিলিত হলো, আর ফেরাউন বাহিনী ডুবে মরল তাতে। বিস্ময়কর হলো—যে পানি ফেরাউনকে ধ্বংস করল, সেই পানিই আল্লাহর আদেশে নবি মুসা আ.-কে এবং তাঁর কওমকে দিলো মুক্তির পথ। এটাই বারাকাহ—আল্লাহর আদেশে নবি মুসা আ.-এর লাঠি হয়ে উঠেছিল বরকতময়। আর তার ফলাফল হয়েছিল সবার সামনে দৃশ্যমান। শুধু সেই যুগের মানুষই নয়, ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে আজও আমাদের চোখের সামনে এই নিদর্শন ভেসে ওঠে।

আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল মারইয়াম আ.-এর জীবনে। তিনি ছিলেন নবি ঈসা আ.-এর জননী। সম্পূর্ণ অলৌকিকভাবে, কোনো পুরুষের সংস্পর্শ ছাড়াই তিনি গর্ভধারণ করেছিলেন। কিন্তু যখন প্রসববেদনা শুরু হলো, তিনি আশ্রয় নিলেন এক জনমানবশূন্য স্থানে, একটি খেজুর গাছের নিচে। তীব্র যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন আল্লাহর এই প্রিয় বান্দি। ঠিক তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে ভেসে এলো আদেশ—

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا

‘আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ড তোমার দিকে নাড়া দাও, তখন তা তোমার ওপর ঝরিয়ে দেবে টাটকা, পাকা খেজুর।’^৫

একজন প্রসূতি নারী, ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত, তীব্র যন্ত্রণায় কাতর; তার পক্ষে তো গাছ নেড়ে ফল ঝরানো অকল্পনীয়। কিন্তু আল্লাহর বারাকাহ এখানে কাজ করেছিল। তাঁর স্পর্শেই খেজুরগাছ থেকে ঝরে পড়েছিল টাটকা খেজুর। এই খেজুরই তাঁকে শক্তি ও সান্ত্বনা দিলো। এটিও দৃশ্যমান বারাকাহ, যা স্বচক্ষে দেখা, হাতে ধরা এবং উপভোগ করা যায়।

দেখুন, গর্ভাবস্থায় একজন নারী কতটা দুর্বল হয়ে পড়েন, এটা আমরা সবাই জানি। সামান্য কাজ করতেও তখন শরীরে শক্তি জোগাড় করা কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ এমন এক নাজুক মুহূর্তে মারইয়াম আ. খেজুরগাছের শক্ত কাণ্ড ঝাঁকিয়ে ফল ঝরাতে পেরেছিলেন! প্রশ্ন জাগে, এ শক্তি তিনি কোথা থেকে পেলেন? এর উত্তর একটাই; এ শক্তি এসেছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দির শরীরে সেই মুহূর্তে এক বিশেষ বারাকাহ দান করেছিলেন। বারাকাহর কারণে তাঁর পেশিতে এমন শক্তি জন্ম নিল যে, তিনি সহজেই খেজুরগাছ নেড়ে তাজা খেজুর সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেন। শুধু সংগ্রহই নয়; সেই খেজুর খেয়ে পরিতৃপ্তি পেলেন, পেলেন শক্তি ও সান্ত্বনা।

এ ঘটনাই প্রমাণ করে, বারাকাহ মানুষের শরীরে শক্তিরূপে নেমে আসে, দুর্বলতাকে পরিণত করে শক্তিতে, অক্ষমতাকে রূপ দেয় সক্ষমতায়। আর এটাই দৃশ্যমান বারাকাহর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যা চোখে দেখা যায়, হাতে ধরা যায় এবং হৃদয়ে অনুভব করা যায়।

নবিজির জীবনে দৃশ্যমান বারাকাহ

এবার শুনুন রাসূল সা.-এর জীবনের এক অনন্য দৃশ্যমান বারাকাহর ঘটনা।

আয়মান রহ. থেকে বর্ণিত, খন্দক যুদ্ধের দিন আমরা সবাই মিলে পরিখা খনন করছিলাম। হঠাৎ এক খণ্ড শক্ত পাথরের মুখে পড়লাম, যা কোনোভাবেই ভাঙা যাচ্ছিল না। সবাই গিয়ে নবি সা.-কে খবর দিলাম। তিনি বললেন, আমি নিজেই খন্দকে নামব। তখন তিনি দাঁড়ালেন। তাঁর পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। কারণ, টানা তিন দিন পর্যন্ত আমরা কোনো খাবার পাইনি।

নবিজি একখানা কোদাল হাতে নিয়ে পাথরটিতে আঘাত করলেন। আশ্চর্যের বিষয়, শক্ত সেই পাথর মুহূর্তেই ভেঙে বালিতে পরিণত হলো। আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিন। অনুমতি পেয়ে আমি স্ত্রীকে গিয়ে বললাম, আজ নবিজির মাঝে এমন কিছু দেখেছি, যা আমার সহ্য হচ্ছে না। মনটাকে একেবারে বিষণ্ণ করে দিয়েছে। তোমার কাছে কোনো খাবার আছে কি?

স্ত্রী বললেন, আমার কাছে কিছু যব আর একটি বকরির বাচ্চা আছে।

আমি বাচ্চাটি জবেহ করলাম, স্ত্রী যব পিষে আটা বানাল। মাংসও ডেকচিও চুলায় দিলাম। রান্না প্রায় শেষ হওয়ার পথে। তখন নবিজির কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কাছে সামান্য কিছু খাবার আছে। আপনি চাইলে একজন বা দুজনকে নিয়ে আসুন।

নবিজি জানতে চাইলেন, কী পরিমাণ খাবার আছে? আমি বিস্তারিত বললাম। তিনি বললেন, এ তো অনেক ভালো ব্যাপার। তারপর তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন—তোমার স্ত্রীকে বলে দিয়ো, আমি আসা পর্যন্ত যেন ডেকচি আর রুটি নামায় না।

এরপর তিনি সবাইকে ঘোষণা দিলেন, উঠো! জাবির তোমাদের খাবারের দাওয়াত দিয়েছে। মুহাজির, আনসার সবাই উঠে তাঁর সঙ্গে রওনা হলেন। এত লোক দেখে আমি স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললাম, হায় আল্লাহ! এখন কী হবে? নবিজি তো পুরো জামাত নিয়ে আসছেন। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে চিন্তার কিছু নেই।

নবিজি এসে বললেন—তোমরা সবাই ঘরে ঢুকো, তবে ভিড় করো না। তারপর নিজ হাতে রুটি টুকরো করে তার ওপরে মাংস রাখলেন এবং সাহাবিদের মাঝে বিতরণ করতে লাগলেন। আশ্চর্যজনকভাবে তিনি ডেকচি ও চুলা ঢেকে রেখেছিলেন, আর সেখান থেকে বারবার খাবার পরিবেশন করছিলেন।

ঘরে উপস্থিত সবাই পেট ভরে খেলো, অথচ খাবার তখনও অবশিষ্ট রয়ে গেল। শেষে নবিজি বললেন, এটা তোমরা নিজেরা খাও এবং অন্যদের হাদিয়া দাও। কারণ, লোকেরা ক্ষুধার্ত।

এ ঘটনাই প্রমাণ করে, বারাকাহ কেবল অদৃশ্য কোনো রহস্য নয়; বরং বাস্তব এক দৃশ্যমান শক্তি। অল্প খাবারে পুরো জামাতের উদরপূর্তি হওয়া, আর তবুও অবশিষ্ট থেকে যাওয়া; এটাই আল্লাহ প্রদত্ত বারাকাহ।

আল্লাহ প্রদত্ত বারাকাহর আরেকটি নিদর্শন বর্ণনা করছি।

আবু হুরায়রা রা. স্বয়ং নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলতেন, আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। ক্ষুধার তীব্র যন্ত্রণায় আমি অনেক সময় উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম। কখনো কখনো পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম।

একদিন তিনি এমন ক্ষুধার্ত অবস্থায় নবিজি ও সাহাবিদের আসা-যাওয়ার রাস্তায় বসে থাকলেন। আবু বকর রা. সেখানে দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু হুরায়রা রা. তাঁকে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। মূলত উদ্দেশ্য ছিল, তিনি হয়তো তা বুঝিয়ে বলার পর কিছু খাবার খেতে দেবেন। কিন্তু কিছুই ঘটল না। এরপর উমর রা. যাচ্ছিলেন। তাঁকেও একইভাবে প্রশ্ন করলেন, তবুও কোনো ব্যবস্থা হলো না।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ সা. সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আবু হুরায়রা রা.-কে দেখেই মুচকি হাসলেন। তাঁর মুখমণ্ডল আর চোখ দেখে নবিজি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলেন তাঁর অবস্থা। তারপর বললেন, হে আবু হুরায়রা!

তিনি বললেন—আমি হাজির, হে আল্লাহর রাসূল!

নবিজি বললেন—আমার সঙ্গে এসো।

তিনি ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, অনুমতি পেলেন। ভেতরে ঢুকে একটি পেয়ালায় কিছু দুধ দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই দুধ কোথা থেকে এলো?

ঘরের লোকেরা বলল, অমুক ব্যক্তি আপনাকে হাদিয়া দিয়েছেন।

এবার নবিজি বললেন, হে আবু হুরায়রা!

তিনি উত্তর দিলেন, হাজির, হে আল্লাহর রাসূল!

নবিজি বললেন, তুমি সুফফাবাসীদের ডেকে নিয়ে এসো।

(রাবি বলেন, সুফফাবাসীরা ছিলেন ইসলামের অতিথি। তাঁদের না ছিল পরিবার, না ছিল সম্পদ, না ছিল নির্ভর করার মতো কেউ। যখন কোনো সাদাকা আসত, নবিজি তা তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন, নিজে তা গ্রহণ করতেন না। আর কোনো হাদিয়া এলে এর কিছু তিনি নিজে রাখতেন এবং কিছু তাঁদের দিতেন। সব সময় তাঁদের শরিক করতেন।)

আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবিজির এ নির্দেশ শুনে আমার মনে হলো, হায়! এখন কী হবে? এ সামান্য দুধ দিয়ে সুফফাবাসীর কী চলবে? তবে এটা আমার জন্য হলে ঠিক ছিল। পান করলে আমার শরীরে শক্তি ফিরে আসত।

সুফফাবাসীরা নবিজির ডাকে সাড়া দিয়ে ঘরে এসে বসলেন। তখন আল্লাহর রাসূল সা. আমাকে বললেন, হে আবু হুরায়রা!

আমি বললাম, আমি হাজির, হে আল্লাহর রাসূল!

তিনি বললেন, তুমি পেয়ালাটি নাও এবং তাঁদের মধ্যে বন্টন করো।

আমার মন ভেঙে গেল। ভেবেছিলাম—এ সামান্য দুধ অন্তত আমাকে তৃপ্ত করবে, কিন্তু এখন তা পুরো সুফফাবাসীর মধ্যে ভাগ হবে। বুঝলাম, আমার আর পাওনা নেই। তবুও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করার উপায় নেই। তাই তাঁদের কাছে গেলাম, ডেকে আনলাম, আর প্রত্যেককে দিলাম।

আমি পেলাম এক বিস্ময়কর দৃশ্য। পেয়ালা হাতে একজনকে দিলাম, তিনি পান করলেন, তৃপ্ত হলেন। আবার আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর আরেকজনকে দিলাম, তিনিও পান করলেন, তৃপ্ত হলেন এবং পেয়ালা ফিরিয়ে দিলেন। এভাবে দিতে দিতে পেলাম—প্রত্যেকে পান করল, তৃপ্ত হলো। আর পেয়ালাটি আমার হাতে ফিরে এলো। অবশেষে পৌঁছে গেলাম রাসূল সা.-এর কাছে।

সবাই পেট ভরে পান করল, অথচ পেয়ালায় দুধ তখনও বাকি! নবিজি পেয়ালাটি হাতে ধরে মৃদু হেসে আমার দিকে তাকালেন। বললেন—হে আবু হুরায়রা!

আমি বললাম, আমি হাজির, হে আল্লাহর রাসূল!

তিনি বললেন, এখন তো আমি আছি আর তুমি।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ঠিক বলেছেন।

তিনি বললেন, তাহলে বসো এবং পান করো।

আমি বসে পান করলাম। তিনি বললেন, আরও পান করো। আমি আবার পান করলাম। তিনি আবারও বললেন, আরও পান করো। আমি পান করতে থাকলাম। এমনকি একসময় বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আর নয়। যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম—আমার পেটে আর বিন্দুমাত্র জায়গা নেই।

তখন তিনি বললেন, তাহলে আমাকে দাও। আমি পেয়ালাটি তাঁকে দিলাম। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন, বিসমিল্লাহ বললেন এবং বাকি দুধ নিজে পান করলেন।

সম্পদে দৃশ্যমান বারাকাহ

দৃশ্যমান বারাকাহর আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা পাই নবিজির সাহাবি আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-এর জীবনে। তিনি যখন হিজরত করে মদিনায় আসেন, তখন ছিলেন একেবারে নিঃস্ব। নিজের নামে কোনো সম্পদ বা পুঁজি কিছুই ছিল না। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। সততা, অধ্যবসায় ও অটল পরিশ্রমকে মূলধন বানিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন। আল্লাহ তায়ালার রহমত ও বারাকাহ তাঁর ওপর এমনভাবে নেমে এলো, অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। তিনি হয়ে উঠলেন মদিনার অন্যতম ধনবান ব্যক্তি।

আল্লাহ তায়ালার তাঁর সম্পদে এমন অফুরন্ত বারাকাহ দান করেছিলেন যে, তিনি পরবর্তী সময়ে একটি সম্পূর্ণ যুদ্ধ বাহিনীর ব্যয়ভার একাই বহন করতে সক্ষম হন। ভাবুন, পুরো একটি যুদ্ধের খরচ একজন মানুষই এককভাবে বহন করছেন! এটি নিঃসন্দেহে দৃশ্যমান বারাকাহর শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলোর একটি। কারণ, সাহাবিরা সবাই তাঁর আগের অবস্থার সাক্ষী ছিলেন, যেখানে তিনি ছিলেন নিঃস্ব।

আবার দেখেছেন পরবর্তী অবস্থা, যেখানে তিনি হয়ে উঠেছেন ধনবান ও উদারমনা দাতা। তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছেন, কীভাবে আল্লাহর বারাকাহ একজন মানুষকে দারিদ্র্যের অন্ধকার থেকে সম্পদের আলোয় পৌঁছে দিতে পারে।

আসলে ‘বারাকাহ’ বা More with Less—এই ধারণা কেবল ইসলামি শিক্ষাতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং অন্য সংস্কৃতিতেও এর ছাপ পাওয়া যায়। ইংরেজি সাহিত্যে একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে, A loaf that fed a Hundred. অর্থাৎ একটি রুটি যা দিয়ে একশজনের আহার সম্পন্ন হয়েছিল। অতীতে এটি প্রবাদ হিসেবেই ব্যবহৃত হতো, তবে এখনও বাগধারা হিসেবে প্রচলিত আছে। অর্থাৎ যখন অল্প কোনো কিছুই ভেতর আশাতীত প্রাচুর্য দেখা দেয়, তখনও ইংরেজরা এই প্রবাদ ব্যবহার করে থাকে।

এখান থেকেও প্রমাণিত হয়, বারাকাহর এই ধারণা মানুষের চেতনায় সর্বজনীনভাবে উপস্থিত। মুসলিমরা একে চেনে আল্লাহর দান হিসেবে, অন্য সংস্কৃতির মানুষ এটিকে চেনে ভিন্ন নামে, ভিন্ন শিরোনামে।